অভিযোগের সুরে বললেন, 'কই মশাই, আপনি তো আপনার পুতুলের খেলা দেখালেন না একদিনও আমাকে। সেই যে ভেন্টিকলোজিয়াম না কী।'

'পুতুল নয়', বলল নবীন, 'এবার অন্য ম্যাজিক ধরব। আপনার যখন শখ আছে তখন নিশ্চয়ই দেখাব। কিন্তু হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন?'

'আপনার এক জাতভাই যে মারা গেছে দেখলুম কাগজে। অক্রুর চৌধুরী।'

'তাই বুঝি?'—নবীন এখনও কাগজ দেখে নি।—'কীসে গেলেন?'

'হৃদ্‌রোগে', বললেন সুরেশবাবু, 'আজকাল তো শতকরা সত্তর জনই যায় ওই রোগেই।'

নবীন জানে যে খোঁজ নিলে নির্ঘাত জানা যাবে মৃত্যুর টাইম হল গত কাল রাত বারোটা বেজে দশ মিনিট।

সন্দেশ, আষাঢ় ১৩৮৮

অতিথি

মন্টু ক'দিন থেকেই শুনেছে তার মা-বাবার মধ্যে কথা হচ্ছে দাদুকে নিয়ে। মন্টুর ছোটদাদু, মা-র ছোটমামা।

দাদুর চিঠিটা যখন আসে তখন মন্টু বাড়ি ছিল। মা চিঠি পড়ে প্রথমে আপন মনে বললেন, 'বোঝো ব্যাপার।' তারপর বাবাকে ডেকে বললেন, 'ওগো শুনছ?'

বাবা বারান্দায় বসে মুচির জুতো মেরামত করা দেখছিলেন। মুখ না তুলেই বললেন, 'বলো।'

মা চিঠি হাতে বেরিয়ে এসে বললেন, 'মামা আসছেন।'

'মামা?'

'আমার ছোটমামা গো।'

বাবার ঘাড় ঘুরে ভুরু কপালে উঠে গেল।

'বলো কী! তিনি বেঁচে আছেন?'

'এই তো চিঠি। মামার যে চিঠি লেখার মতো বিদ্যে আছে সেটাই তো জানতাম না।'

বাবা আরাম কেদারার হাতল থেকে চশমাটা তুলে পরে নিয়ে মা-র দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'কই, দেখি।'

এক পাতার চিঠিটা পড়ে বাবাও বললেন, 'বোঝো।'

মা ততক্ষণে মোড়ায় বসে পড়েছেন।

একটা খটকা লেগেছে দুজনেরই সেটা বেশ বুঝতে পারছে মন্টু। বাবাই প্রশ্নটা করলেন।

'আমাদের ঠিকানা পেলেন কোথায় বলো তো? আর ওঁর ভাগনির সঙ্গে যে সুরেশ বোস বলে একজনের বিয়ে হয়েছে, আর তারা যে এই মামুদপুরে থাকে সেটাই বা জানলেন কী করে?'

মা একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে বললেন, 'শেতলমামা আছেন তো। তাঁর কাছেই জেনেছেন হয়তো।'

'শেতলমামা?'

'আঃ, তোমার আবার কিছু মনে থাকে না। মামাদের পড়শি ছিলেন নীলকণ্ঠপুরে। কত যাতায়াত ছিল আমাদের বাড়িতে। তুমিও তো দেখেছ। বাজি ফেলে ছাপান্নটা রাজভোগ খেলেন আমাদের বিয়েতে, সেই নিয়ে কত হাসাহাসি।'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'ছোটমামার সঙ্গে তো খুব মিতালি ছিল। গোড়ার দিকে মামা যে চিঠি দিতেন সে তো শুনেছি শেতলমামাকেই।'

'এ বাড়িতেও তো এসেছেন না শীতলবাবু?'

'বাঃ, আসেননি? রাণুর বিয়েতেই তো এলেন।'

'ঠিক ঠিক। কিন্তু তোমার ছোটমামা তো শুনেছিলাম সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন।'

'তাই তো জানতাম। তিনি আবার হঠাৎ আমার এখানে আসছেন কেন সেটা তো বুঝলাম না।'

বাবা একটু ভেবে বললেন, 'অবিশ্যি আসতেই যদি হয়তো তোমার কাছে ছাড়া আর কার কাছে আসবেন বলো। তোমার বাপ মা বড় মামা বড় মামী সব পরলোকে। বড় মামার ছেলে ক্যানাডা, মেয়ে সিঙ্গাপুর। তুমি ছাড়া তার আর আছে কে?'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু যে লোকটাকে প্রায় চোখেই দেখিনি তাকে মামা বলে চিনব কী করে? মামা যখন বাড়ি ছেড়ে চলে যান তখন আমার বয়স দু' বছর, আর ওনার ষোলো কি সতেরো।'

'ওঁর ছবি একখানা আছে না তোমার সেই পুরনো অ্যালবামে?'

'তোমার যা কথা! সে চেহারা আর এখনকার চেহারা! তখন মামার বয়স পনেরো আর এখন ষাট।'

'সত্যি, খুব মুশকিলে পড়া গেল।'

'ঘর তো একখানা বাড়তি আছেই, বিনুর ঘর। কিন্তু কী খায় না খায় কিচ্ছু জানা নেই...'

'খাবে আবার কী? আমরা যা খাব তাই খাবে!'

'আমরা যা খাব মানে কী? যদি সাধু হয়ে থাকে তা হলে তো নিরামিষ খাবে। সে তো আরও ঝক্কি। পাঁচ রকম পদের কমে হবে না তার।'

'চিঠির ভাষা দেখে তো সাধু বলে মনে হয় না। দিব্যি আমাদেরই মতো লেখা। ইংরিজিতে তারিখ লিখেছে, ইংরিজি কথা ব্যবহার করেছে। এই তো—আন্‌নেসেসারি।'

'নিজের ঠিকানা তো দেয়নি।'

'তা দেয়নি।'

'আর সোমবারই আসছেন বলে লিখেছেন।'

মা-বাবা দুজনেই খুব ভাবনায় পড়েছেন বলে মনে হল মন্টুর। সত্যি, যে মামাকে কেউ কোনওদিন চোখেই দেখেনি তাকে তো মামা বলে মনে করাই মুশকিল।

মন্টু এই দাদুর কথা বড় জোর একবার কি দু'বার শুনেছে। ইস্কুলে পড়া শেষ হবার আগেই দাদু বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তারপর এই পঁয়তাল্লিশ বছরের গোড়ার কয়েকটা বছরের পর তার আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। মা বলতেন তিনি নিশ্চয়ই মরে গেছেন। মন্টুর দু-একবার মনে হয়েছে দাদু যদি হঠাৎ একদিন ফিরে আসেন তা হলে বেশ হয়। কিন্তু তারপরই মনে হয়েছে—সেরকম কেবল গল্পেই শোনা যায়। তাও গল্পে ঘর-পালানো লোক অনেকদিন পরে ফিরে এলে তাকে চেনবার লোক থাকে। এখানে তাও নেই। দাদু এল কি দাদু সেজে অন্য লোক এল তাও বলার জো নেই।

দাদু অবিশ্যি লিখেছেন বেশিদিন থাকবেন না—দিন দশেক। বাংলাদেশের ছোট মফঃস্বল শহরেই দাদুর ছেলেবেলা কেটেছে। সেই বাংলাদেশ দেখার ইচ্ছে হয়েছে দাদুর। নিজের দেশ নীলকণ্ঠপুরে তো যাওয়া যায় না, কারণ এখন আর সেখানে কেউ নেই। তাই মামুদপুরেই আসতে চান। তাও এখানে একজন ভাগনি আছে তো। মন্টুর বাবা এখানে ওকালতি করেন। মন্টুর দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, সে থাকে রিশড়ায়। দাদা কানপুরে হস্টেলে থেকে পড়ে আই আই টিতে।

রবিবারের মধ্যে মা সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। দোতলার পশ্চিমের ঘরের খাটে নতুন বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, দাদুর জন্য সাবান তোয়ালে গামছা, সবই এসে গেল। ট্রেন আসবে সকালে, দাদু নিজেই সুরেশ বোসের বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করে সাইকেল রিকশা নিয়ে চলে আসবেন। তারপর যা থাকে কপালে। বাবা আজই সকালে বলেছেন, 'মামা হোক আর না হোক, লোকটা যদি সভ্যভব্য মিশুকে হয় তা হলে একরকম চলে যাবে। না হলে এই দশটা দিন হুজ্জতের একশেষ।'

'ভাল্লাগেনা বাপু,' বললেন মা, 'সাপ না ব্যাঙ না বিচ্ছু—কিচ্ছু জানা নেই, এখন সামলাও ঝক্কি।

ঠিকানাও দিল না লোকটা ; তা হলে না হয় কোনও একটা ছুতোয় না করে দেওয়া যেত । এ যেন একেবারে পণ করে ঘাড়ে এসে চাপা ।'

মন্টুর মনের ভাব কিন্তু অন্যরকম । তাদের বাড়িতে অনেকদিন কেউ এসে থাকেনি । এখন তার গ্রীষ্মের ছুটি ; সারাটা দিন সে বাড়িতেই থাকে । খেলার সাথীর অভাব নেই—সিধু, অনীশ, রথীন, ছোটকা—কিন্তু বাড়িতে একজন বাড়তি লোকের মজাটা আলাদা । সারাক্ষণ শুধু মা আর বাবাকে দেখতে কি ভাল লাগে ? আর দাদু-কি-দাদু-নয় মজাটাও কি কম ? এ যেন একটা রহস্য অ্যাডভেঞ্চার । যদি দাদু না হয়, যদি কোনও বদ মতলবে দুষ্টু লোক আসে, আর সেটা যদি মন্টু ধরে দিতে পারে, তা হলে দারুণ ব্যাপার হবে ।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে সদর দরজার বাইরে ঘোরাঘুরি করার পর সোয়া এগারোটার সময় মন্টু দেখল একটা সাইকেল রিকশা আসছে তাদের বাড়ির দিকে । গাড়িতে একজন লোক, তার হাতে একটা মিষ্টির হাঁড়ি, আর পায়ের কাছে একটা চামড়ার সুটকেস । লোকটা সুটকেসের উপর একটা পা তুলে দিয়েছে ।

ইনি সাধু নন । অন্তত সাধুর মতো পোশাক পরেন না । ধুতি-পাঞ্জাবিও নয়, প্যান্ট-সার্ট । মা বলেছিলেন বয়স ষাটের উপর, কিন্তু বেশি বুড়িয়ে যাননি । মাথার চুলও বেশি পাকেনি । চোখে চশমা আছে, তবে পাওয়ার খুব বেশি নয় ।

রিকশাকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বাক্স মাটিতে নামিয়ে রেখে ভদ্রলোক মন্টুর দিকে ফিরে দেখে বললেন, 'তুমি কে ?'

দাড়িগোঁফ নেই, নাকটা চোখা, চোখ দুটো ছোট হলেও উজ্জ্বল ।

মন্টু সুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'আমার নাম সাত্যকি বোস ।'

'অর্জুনের সারথি, না সুরেশ্ বোসের পুত্র ? এই ভারী সুটকেস বইতে পারবে তুমি ? ওতে বই আছে কিন্তু ।'

'পারব ।'

'তবে চলো ।'

ভিতরের বারান্দায় উঠতে মা এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন ভদ্রলোককে । ভদ্রলোক মিষ্টির হাঁড়িটা মা-র হাতে দিয়ে বললেন—

'তোমার নাম সুহাসিনী তো ?'

'হ্যাঁ ।'

'তোমার স্বামী তো উকিল । সে বোধহয় কাজে বেরিয়েছে ?'

'হ্যাঁ ।'

'এইভাবে এসে পড়লাম...খুব কিন্তু-কিন্তু বোধ করছিলাম, জানো, কিন্তু শেষে মনে হল দিন দশেক হয়তো এই বুড়োকে বরদাস্ত করতে তোমাদের খুব অসুবিধে হবে না । তা ছাড়া শীতলদা তোমাদের এত প্রশংসা করলেন । কিন্তু বুঝতে তো পারি, আমি যে সত্যি তোমার মামা তার তো কোনও প্রমাণ নেই । কাজেই সেদিক দিয়ে আমি কিছু দাবিও করব না । একজন বুড়ো মানুষকে আশ্রয় দিলে ক'টা দিনের জন্য—এইটেই ভেবে নিতে হবে তোমাদের ।'

মন্টু লক্ষ করছিল যে মা মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছেন ভদ্রলোকের দিকে । এবার বললেন, 'আপনি চানটান করবেন তো ?'

'খুব বেশি যদি অসুবিধে না হয়—'

'না না, অসুবিধে কেন ? মন্টু, এঁকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দাও চানের ঘরটা । আর, ইয়ে, আপনি কী খানটান সে তো জানা নেই, তাই...'

'আমি সর্বভুক্ । যা দেবে তাই খুশি মনে খাব । কথাটা বাড়িয়ে বলছি না ।'

'তুমি ইস্কুলে পড় ?' দোতলায় উঠতে উঠতে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন মন্টুকে ।

'হ্যাঁ । সত্যভামা হাই স্কুল । ক্লাস সেভেন ।'

মন্টু একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারল না ।

'আপনি বুঝি সাধু নন ?'

'সাধু ?'

'মা বলছিলেন আপনি সাধু হয়ে গেছেন ।'

'ও হো হো ! সাধু-টাধু তো অনেককালের কথা ভাই । যখন প্রথম বাড়ি থেকে বেরোই তখন গেলাম হরিদ্বার । বাড়িতে ভাল লাগত না, তাই বেরিয়ে পড়লাম । একজন সাধুর কাছে গিয়ে ছিলাম বটে কিছুদিন । হৃষীকেশে । তারপর সেখানেও আর ভাল লাগল না, তাই বেরিয়ে পড়লাম । তারপর সাধু-টাধুর কাছে আর যাইনি ।'

দুপুরে খাবার যা ছিল সেটা ভদ্রলোক সত্যিই বেশ খুশি মনে চেঁছেপুঁছে খেলেন । আমিষে কোনও আপত্তি নেই ; মাছ ডিম দুই-ই খেলেন । মন্টুর মনে হল মা একটু নিশ্চিন্ত হয়েছেন । মন্টুর যদিও ভদ্রলোককে দাদু বলতে ইচ্ছে করছিল, সে লক্ষ করল মা একবারও মামা বললেন না ।

যখন দই-এর প্লেটটা পাতে তুলছেন ভদ্রলোক, তখন যেন কতকটা কথা বলার জন্যই মা বললেন, 'বাংলা রান্না অনেকদিন খাওয়া হয়নি বোধহয় ?'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'গত দু'দিনে কলকাতায় খেয়েছি ; তার আগে কতদিন খাইনি বললে বিশ্বাস করবে না ।'

মা আর কিছু বললেন না । মন্টুর ইচ্ছে হচ্ছিল যে জিজ্ঞেস করে—'বাংলা রান্না খাননি কেন ? কোথায় ছিলেন আপনি এতদিন ?' কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আর জিজ্ঞেস করল না । ভদ্রলোক যদি ধাপ্পাবাজ হয়ে থাকেন তা হলে তাকে গুল মারার সুযোগ দেওয়াটা কোনও কাজের কথা নয় । উনি নিজে যদি বলতে চান তো বলুন ।

কিন্তু উনি নিজেও কিছু বললেন না । চল্লিশ বছরের উপর যে লোক নিরুদ্দেশ ছিল তার তো অনেক কিছুই বলার থাকা উচিত, তা হলে এ লোক এত চুপচাপ কেন ?

বাবার গাড়ির আওয়াজ যখন পেল মন্টু তখন সে দোতলায় । সে দেখেছে ভদ্রলোক তখন হাতে একটা বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছেন । তার আগে মন্টু আধ ঘন্টা কাটিয়েছে ভদ্রলোকের সঙ্গে । সে ঘরের বাইরে ঘুরঘুর করছে দেখে ভদ্রলোক নিজেই তাকে ডাকেন ।

'ওহে অর্জুনের সারথি ।'

মন্টু গিয়ে ঢোকে ভদ্রলোকের ঘরে ।

'এসো আমার কাছে' বললেন ভদ্রলোক, 'তোমাকে কিছু জিনিস দেখাই ।'

মন্টু খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ।

'এটা কী ?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক ।

'একটা তামার পয়সা ।'

'কোথাকার ?'

মন্টু পয়সার গায়ে লেখাটা পড়তে চেষ্টা করে পারল না ।

'এটাকে বলে লেপ্টা । গ্রিস দেশের পয়সা । আর এটা ?'

এটাও মন্টু বলতে পারল না ।

'এটা তুর্কির পয়সা । এক কুরু । আর এটা রুমানিয়ার পয়সা । একে বলে বনি । এটা ইরাকের—ফিল ।'

এ ছাড়া আরও দশ দেশের দশ রকম পয়সা মন্টুকে দেখালেন ভদ্রলোক । তার একটাও মন্টু আগে কখনও দেখেওনি, তার নামও শোনেনি ।

'এগুলো সব তোমার জন্য ।'

মন্টু অবাক । ভদ্রলোক বলেন কী ! অনীশের কাকাও পয়সা জমান । উনি মন্টুকে বুঝিয়েছেন যারা এ কাজটা করে তাদের বলে নিউমিস্ম্যাটিস্টস । কিন্তু অনীশের কাকার মোটেই এতরকম পয়সা নেই সেটা মন্টু জানে ।

'আমি তো জানতাম যেখানে যাচ্ছি সেখানে আমার একজন নাতি আছে ; তার জন্য এনেছি এসব পয়সা ।'

মন্টু মহা ফূর্তিতে পয়সাগুলো নিয়ে নীচে নেমে এল মা-কে দেখাতে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে বাবার গলা পেয়ে সে থেমে গেল। এই লোকটার বিষয় কথা বলছেন বাবা।

'...দশ দিনটা বাড়াবাড়ি। ওকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমাদের মনে সন্দেহ আছে। অতিরিক্ত খাতির না করলে ভদ্রলোক আপনিই মানে মানে বিদায় নেবেন। আর কোনওরকম রিস্ক নেওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। আজ সুধীরের সঙ্গে কথা বলছিলাম। সেও অ্যাডভাইস দিল। আলমারি-টালমারি সব ভাল করে বন্ধ করে রাখবে। মন্টু তো সব সময় পাহারা দেবে না। তার বন্ধু-বান্ধব আছে, খেলাধুলো আছে। আমি কাজে বেরিয়ে যাব। বাড়িতে তুমি আর সদাশিব। সদাশিব কাজ না থাকলেই ঘুমোয়। তুমিও যে দুপুরে ঘুমোও না তা তো নয়।'

'একটা কথা তোমায় বলি,' বললেন মন্টুর মা।

'কী ?'

'এনার সঙ্গে কিন্তু মায়ের আদল আছে।'

'তোমার তাই মনে হল ?'

'সেই রকম টিকোলো নাক, চোখের চাহনিও যেন সেইরকম।'

'আহা, আমি তো বলছি না ইনি তোমার মামা নন। কিন্তু মামা লোকটি কেমন তা তো কিছুই জানি না আমরা। লেখাপড়া করেননি, কোনও ডিসিপ্লিন নেই, ছন্নছাড়া জীবন...। আমার মোটেই ভাল লাগছে না ব্যাপারটা।'

বাবার কথা থামলে পর মন্টু ঘরে ঢুকল। এই ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই মন্টুর ভদ্রলোককে বেশ ভাল লেগে গেছে। বাবার কথাগুলো সে পছন্দ করেনি। হয়তো পয়সাগুলো দেখলে বাবার মনটা ভদ্রলোকের প্রতি একটু নরম হবে।

'এই কয়েন উনি দিলেন ?'

মন্টু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'উনি কি এসব জায়গায় গেছেন বলে বললেন নাকি ?'

'না, তা বলেননি।'

'তাও ভাল। এ জিনিস কলকাতায় কিনতে পাওয়া যায়। চৌরঙ্গিতে দোকান আছে।'

সাড়ে চারটে নাগাদ দোতলা থেকে নেমে এলেন ভদ্রলোক। তারপরেই বাবার সঙ্গে আলাপ হল।

'আপনার ছেলের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে,' বললেন ভদ্রলোক।

'হ্যাঁ, ও তাই বলছিল।'

মায়ের মতো বাবাও ঘন ঘন দৃষ্টি দিচ্ছেন ভদ্রলোকের দিকে।

'আমি দেখেছি কম বয়সী ছেলেদের সঙ্গে আমার খুব চট করে ভাব হয়ে যায়। ভবঘুরেদের বোধহয় ওরাই সবচেয়ে ভাল বোঝে।'

'আপনি বুঝি সারাজীবনই ঘুরেছেন ?'

'তা ঘুরেছি। এক জায়গায় বসে থাকা ধাতে ছিল না আমার।'

'আমরা আবার গুছোনো জীবনটাই বুঝি। উদ্দেশ্যহারা ভাবে ঘোরাঘুরি আমাদের পোষায় না। রোজগার আছে, সংসারের দায়িত্ব আছে, সন্তানপালন আছে। আপনি তো বিয়ে করেননি ?'

'না।'

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'সুহাসিনীর বোধহয় মনে নেই; ওর এক প্রমাতামহ—আমার এক দাদু—তাঁরও ঠিক এই প্রবৃত্তি ছিল। উনি তেরো বছর বয়সে ঘরছাড়া হন। আমি তো অল্পদিনের জন্য হলেও ফিরেছি। উনি আর একেবারেই ফেরেননি।'

মন্টু দেখল বাবা মা-র দিকে ফিরলেন।

'এটা জানতে তুমি ?'

'জানলেও এখন আর মনে নেই,' বললেন মা।

বিকেলে চা খাবার পর এক ব্যাপার হল। মন্টুর বন্ধুরা ক'দিন থেকেই শুনছে যে সোমবার তার এক দাদু আসবে যাকে দাদু বলে চেনার কোনও উপায় নেই। তারা ভারী কৌতূহলী হয়ে এল সেই দাদুকে দেখতে। চার-পাঁচটি দশ-বারো বছরের ছেলেকে একসঙ্গে দেখে দাদুও খুব খুশি। সবাইকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন লাঠি হাতে নিয়ে। মিত্তিরদের বাড়ি পেরিয়ে মাঠটার একধারে কদম গাছটার তলায় বসে দাদু বললেন, 'তুয়ারেগ কাদের বলে জানো ?' সকলেই মাথা নেড়ে না বলল। দাদু বললেন, 'সাহারা মরুভূমি জানো তো ?—সেই সাহারায় তুয়ারেগ বলে একরকম যাযাবর জাতি বাস করে। দরকার হলে তারা দস্যুবৃত্তি করে। সেই তুয়ারেগের কবলে পড়ে একজন লোক কী ভাবে রক্ষা পেয়েছিল বুদ্ধির জোরে সে গল্প বলি তোমাদের।'

দাদুর গল্প ছেলের দল মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলে। মন্টু পরে মা-কে বলেছিল, 'এমন গল্প, ঠিক মনে হয় সব কিছু চোখের সামনে দেখছি।'

বাবা কাছেই ছিলেন, বললেন, 'গল্পের বই পড়ার বাতিক আছে বুঝি ভদ্রলোকের ? কোনও এক ইংরিজি পত্রিকায় এ ধরনের একটা গল্প পড়েছি বলে মনে হচ্ছে।'

মন্টু বলেছিল ভদ্রলোকের সুটকেসে বই আছে সেটা সে জানে, তবে গল্পের বই কি না জানে না।

তিনদিন তিন রাত চলে এই ভাবে। বাড়ির কোনও কিছু চুরি হল না, ভদ্রলোক কোনও উৎপাত করলেন না, যা দেওয়া হল তাই তৃপ্তি করে খেলেন, কোনও বাড়তি আবদার করলেন না, কোনও বিষয়ে অভিযোগ করলেন না। এ ক'দিনে বাবার বেশ কয়েকজন উকিল বন্ধু এসেছে মন্টুদের বাড়িতে। এমনিতে বেশি আসে-টাসে না ; মন্টু জানে তারা এই দাদু-কি-দাদু-নয় বুড়োকেই দেখতে এসেছে। মা-বাবাকে দেখে মনে হয় তারা মোটামুটি বুড়োকে মেনেই নিয়েছেন। বাবাকে তো একদিন বলতেই শুনেছে মন্টু—'লোকটা সাদাসিধে এটা বলতেই হবে। বেশি গায়ে পড়ার চেয়ে এই ভাল, তবে এরকম মানুষের বেঁচে থেকে কী লাভ জানি না। আসলে বাড়ি ছেড়ে পালানোর মানে বোঝো তো ?—দায়িত্ব এড়ানো। এঁরা পরাশ্রয়ী জীব। সারা জীবনটাই হয়তো এর-ওর ঘাড়ে ভর করে কাটিয়েছে।'

মন্টু একবার ছোটদাদু বলে ডেকে ফেলেছিল ভদ্রলোককে, তাতে তিনি শুধু মৃদু হেসে তার দিকে চেয়েছিলেন, কিছু বলেননি। মা কিন্তু মামা বলে ডাকেননি একবারও। মন্টু সে কথা বলাতে মা বলেছেন, 'তাতে ভদ্রলোক খুব একটা দুঃখ পাচ্ছেন বলে তো মনে হয় না। আর মামা যে ডাকব, তারপর যদি বেরোয় মামা নন, তা হলে কী অপ্রস্তুতের ব্যাপার বল তো।'

চারদিনের দিন ভদ্রলোক বললেন আজ একটু বেরোবেন। —'নীলকণ্ঠপুর বাস যায় না ?'

বাবা বললেন তা যায়। বাজার থেকে এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর বাস ছাড়ে।

'তা হলে ভাবছি জন্মস্থানটা একবার দেখে আসব। ফিরতে অবিশ্যি বিকেল হয়ে যাবে।'

'খেয়ে যাবেন তো ?' প্রশ্ন করলেন মন্টুর মা।

'নাঃ। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়াই ভাল। ওখানেই হোটেলে কোথাও খেয়ে নেব। ওর জন্য চিন্তা কোরো না।'

ন'টার মধ্যেই ভদ্রলোক বেরিয়ে পড়লেন।

দুপুরে মন্টু আর লোভ সামলাতে পারল না। ভদ্রলোকের ঘর খালি। ওঁর সুটকেসটায় কী বই আছে সেটা দেখার শখ অনেকদিন থেকেই। বাবা নেই, মা একতলায় বিশ্রাম করছেন ; মন্টু গিয়ে ঢুকল ভদ্রলোকের ঘরে।

সুটকেসে তালা নেই। চুরির ভয়টা নেই ভদ্রলোকের সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

মন্টু সুটকেসের ডালাটা তুলল।

কিন্তু কোথায় বই ? বই তো নেই, খাতা। খান ত্রিশেক নানারকমের খাতা, তার মধ্যে দশবারোটা বাঁধিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু খাতা খুলল মন্টু। পরিষ্কার ঝকঝকে বাংলা হাতের লেখা, পড়তে কোনও অসুবিধে নেই।

মন্টু খাটের উপর উঠল খাতাটা নিয়ে।

আর পরমুহূর্তেই নেমে আসতে হল।

তার অজান্তে মা উপরে উঠে এসেছেন।

'ও ঘরে কী হচ্ছে মন্টু ? ওনার জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছ বুঝি ?'

মন্টু সুবোধ বালকের মতো খাট থেকে নেমে এসে সুটকেসে খাতাটা রেখে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

'যাও, নিজের ঘরে যাও। পরের জিনিস ঘাঁটতে নেই। নিজের বই পড়ো গিয়ে যাও।'

ছ'টার একটু পরেই ফিরে এলেন ভদ্রলোক।

রাত্তিরে খাবার সময় মন্টুর মা-বাবাকে বেশ খানিকটা অবাক করে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন তিনি কালই ফিরে যাচ্ছেন।

'তোমাদের আতিথেয়তার তুলনা নেই, কিন্তু আমার পক্ষে এক জায়গায় বেশিদিন থাকা পোষায় না।'

বাবা-মা যে খবরটা শুনে অখুশি নন এটা মন্টু জানে, যদিও তার নিজের মনটা খারাপ হয়ে গেছে। বাবা বললেন, 'আপনি কি কলকাতায় যাবেন এখান থেকে ?'

'হ্যাঁ, তবে সেও বেশিদিনের জন্য নয়। সেখান থেকে অন্য কোথাও পাড়ি দেব। কারুর গলগ্রহ হয়ে থেকে অভ্যেস নেই। আমি সেই বাড়ি ছাড়ার পর থেকেই স্বাধীন।'

মা বললেন, 'গলগ্রহ বলছেন কেন, আমাদের তো কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না।'

খানিকটা যে হচ্ছিল সেটা মন্টু জানে, কারণ সে এর মধ্যে একদিন বাবাকে বলতে শুনেছে যে এই মাগ্যির বাজারে একজন বাড়তি লোকের পিছনে খরচ অনেক।

এবার মন্টু আর বাবা দুজনেই গেল ভদ্রলোককে স্টেশনে পৌঁছাতে, বাড়ির গাড়িতে করে। মন্টু জানে যে ট্রেন যখন ছাড়ল, তখন অবধি বাবার মনে সন্দেহ আছে যিনি এসে রইলেন এতদিন, তিনি সত্যি করেই মন্টুর দাদু কি না।

সাতদিন পর আরেক বৃদ্ধ এসে হাজির হলেন মন্টুদের বাড়িতে। ইনি মন্টুর মায়ের শেতলমামা। এঁকে এর আগে একবারই দেখেছে মন্টু, দিদির বিয়েতে।

'সে কী, শেতলমামা, হঠাৎ কী মনে করে ?'

'একটা কর্তব্য সারতে এসেছি রে। একটা নয়, দুটো। নইলে এই বুড়ো বয়সে আজকের দিনে এমনি এমনি কেউ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে পাড়ি দেয় ? দুপুরে খাব কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই খাবেন। কী খেতে মন চায় বলুন। এখানে সব পাওয়া যায়, কলকাতার মতো নয়।'

'দাঁড়া দাঁড়া, আগে কাজগুলো সারি।'

কাঁধে ঝোলানো থলি থেকে ভদ্রলোক একটা বই বার করলেন।

'এ বইয়ের নাম শুনিসনি তো ?'

মা বইটা হাতে নিয়ে বললেন, 'কই, না তো।'

'পুলিন তোদের বলেনি সেটা জানি।'

'পুলিন ?'

'তোর ছোটমামা ! যে লোক কাটিয়ে গেল এখানে পাঁচটা দিন তার নামটাও জানিস নি ? এ তারই লেখা বই।'

'তাঁর বই ?'

'তোরা কোন্ রাজ্যে থাকিস ? সেদিন কাগজেও তো নাম বেরিয়েছে। এমন আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্যে ক'টা আছে ?'

'কিন্তু এই নাম তো—'

'নাম তো ছদ্মনাম। সারা পৃথিবী ঘুরেছে চল্লিশ বছর ধরে, অথচ এতটুকু দম্ভ নেই।'

'সারা পৃথিবী— ?'

'পুলিন রায়ের মতো অত বড় ভূপর্যটক ভারতবর্ষে আর হয়নি। আর সব নিজের রোজগারে ঘোরা। খালাসিগিরি থেকে শুরু করে কুলিগিরি, কাঠের মজুরি, খবরের কাগজ বিক্রি, দোকানদারি, লরির ড্রাইভারি—কোনও কাজ সে বাদ দেয়নি। তার অভিজ্ঞতার কাছে গল্প হার মেনে যায়। সে বাঘের কবলে পড়েছে, সাপের ছোবল খেয়েছে, সাহারায় দস্যুদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে এসেছে, জাহাজডুবি থেকে সাঁতরে উঠেছে ম্যাডাগাস্কারের ডাঙায়। থার্টি নাইনে সে ভারতবর্ষ ছেড়ে আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সে বলে বাপের বাড়ির মায়া একবার কাটাতে পারলে সারা পৃথিবীটাই হয়ে যায় নিজের ঘর। সাদা কালো ছোট বড় জংলি সভ্য সব এক হয়ে যায়।'

'কিন্তু—এসব আমাদের বললেন না কেন ?'

'তোদের মতো ঘরকুনো কূপমণ্ডূক কি এসব কথা বিশ্বাস করত ? সে আসল কি নকল তাই তোরা ঠিক করতে পারিসনি, তাকে মামা বলে ডাকতে পারিসনি, আর এত কথা সে বলতে যাবে তোদের ?'

'ইস্—আবার ডেকে আনা যায় না মামাকে ?'

'উঁহু। পাখি উড়ে গেছে। বললে বলিদ্বীপটা দেখা হয়নি, সেখানে যাবার চেষ্টা করবে। এই বইটা তোদের দিয়ে গেছে। তোদের ঠিক দেয়নি, দিয়েছে দাদুকে। বললে ওর মনটা এখনও কাঁচা, ওতেই ছাপটা পড়বে ভাল। তবে ওর আসল পাগলামোর কথাটা বলিনি এখনও। ওকে পই পই করে বললাম যে আর ক'টা দিন থেকে যাও, এ বই নির্ঘাত পুরস্কার পাবে, অ্যাকাডেমি দশ হাজার

টাকা দিচ্ছে আজকাল। সে কিছুতেই শুনলে না। বললে টাকা যদি আসে তো মামুদপুরে আমার ভাগনিকে দিয়ে দিয়ো, সে খুব যত্ন নিয়েছে আমার। শুধু মুখে বলা না, কাগজে লিখে দিলে।—এই নে সেই টাকা।'

মা শেতলমামার হাত থেকে খামটা নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ধরা গলায় বললেন, 'বোঝো ব্যাপার।'

রচনাকাল আষাঢ় ১৩৮৮ (১৯,২০/৭/৮১) সরাসরি 'আরো বারো' বইতে। প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮১